মনুষের স্বরূপ (Nature of Man)

মানুষকে নিয়ে সমগ্র বিশ্বজগতের স্বরূপ প্রসঙ্গে উপনিষদে বলা হয়েছে,

'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

—'সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর থেকে সমস্ত প্রাণীকুলের উৎপত্তি, সেই সর্বব্যাপী আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরের দ্বারাই সমস্ত প্রাণীর জীবনধারণ, এবং সেই সর্বব্যাপী আনন্দের মধ্যেই তারা সকলে গমন করে, প্রবেশ করে।'

উপনিষদের এমন অভিমত অনুসরণ করেই গান্ধীজি মানুষের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। গান্ধীজিরও অভিমত হল, এক সর্বব্যাপী চিৎস্বরূপ সত্তা বা ঈশ্বর থেকে জগতের জড়-অজড় সমস্ত কিছুর উৎপত্তি হয়েছে। অদ্বৈতপন্থীদের মতো, গান্ধীজিও বিশ্বাস করেন যে, জড়জগৎ, উদ্ভিদজগৎ, পশু-পক্ষীর জগৎ এমনকি মানুষের জগৎ একই চিন্ময় সত্তার বিকাশ হওয়ায় তারা প্রত্যেকে আত্মীয়বন্ধনে আবদ্ধ। মানুষ বিশ্বজগতের অঙ্গীভূত হওয়ায় জগতের প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে তার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। গান্ধীজি একটি রূপকের উল্লেখ করে বলেন, জগৎ-ব্যবস্থা একটি ত্রিকোণ ভূমি-ভিত্তিক পিরামিডের মতো নয়, যার সর্বনিম্নতলের ভিত্তিভূমি হল জড় এবং যার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ বা চূড়া হল মানুষ। জগৎ-ব্যবস্থাটি হল, নিরন্তর প্রসারিত বৃত্তের অনুরূপ যার অন্তর্গতরূপে আছে মানুষের জগৎ, প্রাণী জগৎ, জড়জগৎ এবং বিশ্বের সবকিছু। চিৎস্বরূপ ঈশ্বর এই সমস্ত কিছুর মধ্যে ব্যাপ্ত থাকার জন্য জড়জগৎও ঈশ্বরের প্রকাশ হওয়ায় চৈতন্যময়।

মানুষের সঙ্গে উদ্ভিদজগতের, ইতর প্রাণীর জগতের গুণগত কোন প্রভেদ নেই, কেননা জগতের সকল কিছুর মধ্যেই চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অবস্থান। মানুষের সঙ্গে অপরাপর বস্তুর সম্পর্ক তাই সহযোগিতার সম্পর্ক, মৈত্রী বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক—অসহযোগিতা বা শত্রুতার সম্পর্ক নয়। এজন্যই গান্ধীজি বলেন বনানী ও বন্য-প্রাণী সংরক্ষণ এবং জীবসেবার মধ্যেই নিহিত আছে মানুষের নীতি ও তার ধর্ম। মৈত্রী-বন্ধনেই মানুষের নীতি ও ধর্ম। এখানেই পাশ্চাত্য নীতিবোধের সঙ্গে গান্ধীজির মতাদর্শের পার্থক্য। অ্যারিস্টটলের মতে, মানুষই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং মানুষের প্রয়োজনেই জড়জগৎ ও জীবজগতের আবির্ভাব ঘটেছে। অ্যারিস্টটল বলেন, 'উদ্ভিদের প্রয়োজনে আলো-বাতাস-জল-স্থল সমাকীর্ণ জড়জগৎ; পশুপক্ষীদের প্রয়োজনে উদ্ভিদজগৎ, আর মানুষের প্রয়োজনে প্রাণীজগৎ, উদ্ভিদজগৎ ও জড়জগৎ—সবকিছুই মানুষের প্রয়োজন-সাধকরূপে আবির্ভূত হয়েছে। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরাও মনে করেন যে, মানুষ কেবল তার স্রষ্টা ঈশ্বরের কাছে এবং তার প্রতিবেশী মানুষের কাছেই দায়বদ্ধ, মনুষ্যেতর প্রাণীর কাছে, উদ্ভিদের কাছে মানুষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। ঈশ্বরের বিধান অমান্য করা পাপ (sin) হলেও, প্রতিবেশীর ক্ষতি করা অপরাধ হলেও, মানুষ তার প্রয়োজনবোধে বৃক্ষতরুলতা বিনষ্ট করতে পারে, পশুহত্যাও করতে পারে, কেননা তাদের প্রতি মানুষের কোন দায়বদ্ধতা নেই।

মানুষের দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের উপরিউক্ত অভিমতকে গান্ধীজি নীতি-বিরোধী ও ধর্ম-বিরোধী বলেছেন। ভারতীয় ধ্যানধারণা অনুসরণ করে গান্ধীজি জগতের সকল কিছুকেই স্বতঃমূল্যবান বলেছেন, কেননা সমগ্র বিশ্বজগৎ আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরের প্রকাশ। উপনিষদের ঋষি বলেছেন—

মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধী।
মধু নক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধুমান্নো বনস্পতিমধুমাং অস্তু সূর্যঃ

—'মধুময় ঈশ্বরের প্রকাশরূপে জগৎ মধুময়—বাতাস মধু বহন করে, সমুদ্র মধু ক্ষরণ করে। বনস্পতি, রাত্রি, উষা, পৃথিবীর ধূলিকণা, সূর্য—সবই মধুময় হোক', মধুময় মানুষের জীবনে যে মধুময় আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরের প্রকাশ—সমগ্র জগতে তারই প্রকাশ উপলব্ধ হোক'। গান্ধীজিও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করে বলেন, জগতের অপরাপর বিষয়ের সঙ্গে মানুষের পরিমাণগত তারতম্য (চৈতন্যের প্রকাশ সর্বত্র সমান নয়) স্বীকার করা গেলেও গুণগত তারতম্য স্বীকার করা যায় না, কেননা জগতের সবই চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের প্রকাশ বা অভিব্যক্তি। বিচারশীল জীবরূপে মানুষের তাই উচিৎকর্ম হল, বীজন অঞ্চল সংরক্ষণ করা, বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও বন্য পরিবেশে বর্ধনের সাহায্য করা। এসব প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট করা চৌর্যবৃত্তির নামান্তর। এসব সম্পদ বিনষ্ট করা যেমন আইনগতভাবে অপরাধ, তেমনি নীতিগতভাবে অন্যায়, পাপ। অহিংসা মন্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক গান্ধীজি একান্ত প্রয়োজনে প্রাণীহত্যাকে, **পরিতাপসহ**, সমর্থন করলেও রসনার পরিতৃপ্তির উদ্দেশে এমনকি বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যও প্রাণীহত্যাকে মানুষের জীবনে জঘন্যতম অপরাধ বলেছেন। প্রাণীহত্যা, গান্ধীজির মতে, আত্মজন হত্যারই সমতুল্য, কেননা বিশ্বজগতের সকল কিছুর মধ্য দিয়েই এক ও অদ্বয় সত্যের (Truth), গান্ধীজি যাকে চিৎস্বরূপ 'ঈশ্বর' বা 'ভগবান' বলেছেন, অভিব্যক্তি। গান্ধীজি বিশ্বাস করেন যে, এমন উপলব্ধি হলে অর্থাৎ ইতর জীবের সঙ্গে আত্মিক বন্ধন উপলব্ধ হলে মানুষমাত্রই জীবহত্যা থেকে বিরত থাকবে। গান্ধীজি আরও বলেন যে, শস্যধ্বংসকারী ইতর প্রাণী, মানুষের প্রাণ নাশক বিষধর সর্প প্রভৃতিকেও হত্যা না করে মানুষের উচিত কর্ম হবে তাদের আবদ্ধ করে যথা যথা স্থানে প্রেরণ করা।

ভিন্ন ভিন্ন মানুষ একই সম্বন্ধ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এক 'সমগ্র' রচনা করে, যে সমগ্রের

করে, অপমানিত করে তাহলে সেই সঙ্গে নিজেই নিজেকে পদানত ও অপমানিত করে, কেননা করুণাময় ঈশ্বরে প্রকাশরূপে সব মানুষ আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ। গান্ধীজির এই অভিমত রবীন্দ্রনাথ অনবদ্য ছন্দবদ্ধ ভাষায় মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—

'যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।'

ভারতীয় জাত-পাত ভিত্তিক কলঙ্কিত সমাজ-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতো গান্ধীজিও তাঁর অভিমত প্রকাশ করে বলেন, বৃহৎ শূদ্রশক্তিকে অবহেলা করে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা কখনো উন্নত হতে পারে না এবং তাদের (শূদ্রদের) উন্নতিসাধন করা গেলে সমগ্র সমাজও উন্নত হয়। গান্ধীজি তাঁর এই অভিমত কেবল তত্ত্বের মধ্যেই আবদ্ধ রাখেননি, 'হরিজন আন্দোলনের' মাধ্যমে তাকে বাস্তবায়িত করতেও প্রয়াসী হয়েছেন।

গান্ধীজি বিশ্বাস করেন যে, মানুষের চরম লক্ষ্য হল আত্মোপলব্ধি (self-realisation), অন্তস্থ আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি, পরমসৎ ঈশ্বরের প্রকাশরূপে বিশ্বের সকল কিছুর সঙ্গে, বিশেষত বিশ্ব মানবের সঙ্গে একাত্মতা-উপলব্ধি। গান্ধীজি একেই বলেছেন সত্যোপলব্ধি বা ঈশ্বর-উপলব্ধি। এই আত্মোপলব্ধি বা আত্মবিকাশের জন্য গান্ধীজি আত্মসেবার পরিবর্তে সমাজসেবাকেই উত্তম মাধ্যম বলেছেন। হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজি বলেছেন, 'সত্যকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে (গান্ধীজির মতে, যা সত্য তাই ঈশ্বর, যা ঈশ্বর তাই সত্য) লাভ করতে হলে তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়েই লাভ করতে হবে। সবার সেবার মাধ্যমেই এটা সম্ভব হতে পারে— মানুষকে বাদ দিয়ে, মানুষের সমাজকে বাদ দিয়ে 'ঈশ্বর' বলে আমার কাছে কিছু নেই।'* এই প্রকারে ঈশ্বর উপলব্ধির জন্য জৈব প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে যথাসম্ভব প্রশমিত করে উচ্চবৃত্তি বুদ্ধি-বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।

গান্ধীজি এবিষয়ে অবহিত যে, মানুষের মধ্যে নিয়ত চলে দেবাসুরের দ্বন্দ্ব, 'ছোট আমি'র সঙ্গে 'বড় আমি'র দ্বন্দ্ব, জৈব বিষয়-কামনার সঙ্গে বিশুদ্ধ বুদ্ধির বিষয় ত্যাগের দ্বন্দ্ব। গান্ধীজি জৈব কামনা-বাসনাকে সমূলে বিনাশ করতে বলেন না, তাদের ঈশ্বরদত্ত বিবেকবুদ্ধির দ্বারা পরিশীলিত ও পরিশুদ্ধ করতে বলেন। ইন্দ্রিয় প্রধান 'ছোট আমি'কে 'বড় আমি'র দ্বারা বশীভূত করা না গেলে মানুষের জীবনে সর্বনাশ উপস্থিত হয়। এপ্রসঙ্গে গান্ধীজি গীতোক্ত একটি অমৃতবাণী প্রায়শই স্মরণ করেন**

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।।২/৬২
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংসাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।২/৬৩

অর্থাৎ **বিষয় চিন্তাই** সব অনর্থের মূল। বিষয়চিন্তা সেই বিষয়ে **আসক্তি** জন্মায়; আসক্তি থেকে **কামনার** উৎপত্তি হয়; কামনা প্রতিহত হলে **ক্রোধ** জন্মায়; ক্রোধ থেকে **মোহ**, মোহ থেকে **স্মৃতিভ্রম**, স্মৃতিভ্রম থেকে **বুদ্ধিনাশ** এবং বুদ্ধিনাশ থেকে সর্বনাশ বা **বিনাশ** ঘটে। এই প্রকারে, কামনা-বাসনা-জড়িত বিষয়চিন্তায় আধ্যাত্মিক জীবনের বিনাশ হয় এবং ঈশ্বর-উপলব্ধি ব্যাহত হয়।

আধ্যাত্মিক ভাবনায় পুষ্ট গান্ধীজি এজন্য বলেন, আত্মোপলব্ধি বা সত্য-উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভব হলেও সেই উপলব্ধির পথ সুগম নয়, অতিশয় দুর্গম। ইন্দ্রিয়-প্রধান 'ছোট আমি'কে বিচার শক্তির দ্বারা 'বড় আমি'র বশীভূত করা এবং 'বড় আমি'কে ক্রমশ প্রসারিত ও পরিশুদ্ধ করা অতি কঠিন কাজ, যার জন্য প্রাণপাত প্রয়াসের প্রয়োজন হয়। আত্মোপলব্ধির জন্য, 'আমার অন্তরবাসী ঈশ্বর'ই (বা 'সত্যই', কেননা গান্ধীর মতে, যা 'সত্য' তাই ঈশ্বর) সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, এমন উপলব্ধির জন্য বাসনা-বিজড়িত 'ছোট আমির' যেমন কণ্ঠ রোধ করতে হয়, তেমনি বিচারশীল 'বড় আমি'কেও ক্রমশ সম্প্রসারিত করে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত করতে হয়, যেখানে ব্যক্তির স্বকীয়তা বলে আর কিছুই থাকে না, সে এক অকিঞ্চিতকর পদার্থে (cypher) বা শূন্যে পরিণত হয়।

* হরিজন। ১৯৩৬।

এমন এক অবস্থাই হল আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিপূর্ণতা (perfection) বা 'আত্মোপলব্ধি' (self-realisation)। এমন উপলব্ধিতেই মানুষ তার স্বস্বরূপ (real nature) উপলব্ধি করতে পারে— বিশ্বজনকে আত্মজনজ্ঞানে গ্রহণ ক'রে প্রেম ও ভালবাসাকে পাথেয় ক'রে এবং অহিংসাকে একমাত্র অস্ত্র ক'রে সমাজসেবায়, বিশ্বজনের হিতার্থে অকুতোভয়ে সমস্ত বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সত্যের প্রতি ('সবই ঈশ্বর বা ভগবান' এমন বিশ্বাসের প্রতি) অবিচল ও ঐকান্তিক আগ্রহ—সত্যাগ্রহ। স্বস্বরূপ উপলব্ধির জন্য গান্ধীজি মানুষকে সত্যাগ্রহী হতে বলেছেন।

আধ্যাত্মিক ভাবধারায় পুষ্ট গান্ধীজির নৈতিকধর্ম অনুসারে, আধ্যাত্মিক জীবনে উৎকর্ষলাভ করতে হলে ইন্দ্রিয়প্রবণ 'ছোট আমির' মৃত্যু ও রূপান্তর আবশ্যক এবং একইভাবে 'বড় আমির'ও মৃত্যু ঘটিয়ে এক 'ব্যাপকতর বড় আমি'তে রূপায়িত হওয়া প্রয়োজন। এভাবেই **দ্বান্দ্বিক** পদ্ধতিতে (Hegel যে পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন) হতে হবে নৈতিক জীবনের অগ্রগমন যে পর্যন্ত না সর্বভূতে আত্মদর্শন (ঈশ্বর-দর্শন) করে পরিপূর্ণতা লাভ করা যায়। এখানে 'মৃত্যু' অর্থে বিনাশ বা অবলুপ্তি নয়—'মৃত্যু' অর্থে উন্নততর জীবনে রূপান্তরিত হওয়া। অন্তহীন 'নেতি' 'নেতি' অর্থাৎ নিষেধমূলক আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে অন্তহীন ইতিমূলক প্রাপ্তি ঘটে এবং এভাবেই চলে সত্যাগ্রহীর আত্মোপলব্ধির বা (সত্য-উপলব্ধি বা ঈশ্বর-উপলব্ধির) অন্তহীন পথে অগ্রসর হওয়া। এই নিরন্তর আত্মত্যাগ সত্যাগ্রহীর কাছে বেদনাদায়ক নয়, কেননা ঐ আত্মত্যাগের (ব্যক্তি-আমির মৃত্যুর) পথ ধরেই অবশেষে আসে আত্মোপলব্ধির অনাবিল প্রশান্তি। এভাবে, আধ্যাত্মিক জীবনে চরম উৎকর্ষ লাভ করতে হলে মানুষকে সর্বস্বার্থ পরিত্যাগ করে অকিঞ্চিতকর (cypher) হতে হবে এবং গান্ধীজির মতে, এটাই হল সত্যোপলব্ধি বা ঈশ্বর উপলব্ধি, আরও স্পষ্টভাবে মানুষের স্বস্বরূপ (nature of man) উপলব্ধির **সুবর্ণ পথ** (golden means)— সর্বোত্তম উপায়— জীবন-সত্যকে উপলব্ধির জন্য **তপস্যা**।

... এবং রবীন্দ্রনাথও জীবনসত্যকে উপলব্ধির জন্য আধ্যাত্মিক জীবনের চরম

means)— সর্বোত্তম উপায়— জীবন-সত্যকে উপলব্ধির জন্য তপস্যা।

উল্লেখযোগ্য যে, স্বামী বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথও জীবনসত্যকে উপলব্ধির জন্য আধ্যাত্মিক জীবনের চরম উৎকর্ষলাভেরই উল্লেখ করেছেন এবং ঐ লক্ষ্য সাধনের জন্য হিংসার পথ সর্বৈব পরিহার করে জীবের প্রতি প্রেম-ভালবাসা বিতরণকেই সর্বোত্তম মাধ্যম বলেছেন। কিন্তু দীনাত্মা মহাত্মার অমৃতবাণীতে কর্ণপাত করে না, দীনাত্মার হৃদয় মহাত্মার উপদেশ ও নির্দেশে রূপান্তরিত হয় না। বিশ্বজুড়ে মানুষ এখন, বিশেষত 'মহান' বিশেষণযুক্ত ভারতবর্ষে, আরও বিশেষত 'ধন-ধান্যে-পুষ্পে ভরা' বিশেষণযুক্ত বঙ্গদেশে, ইন্দ্রিয়-প্রবণ স্বার্থান্বেষী 'ছোট আমি'র পরিচর্যায় কপটতা ও ভ্রষ্টাচারকেই জীবনের পরমার্থরূপে গণ্য করে। দীনাত্মার সমাজে আজ মহাত্মাদের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'।

মানুষের জগতেও ভিন্ন ভিন্ন মানুষ একই সম্বন্ধ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এক 'সমগ্র' রচনা করে, যে সমগ্রের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তি পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। মানুষের সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি তার অস্তিত্বের জন্য, বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য একাধিক ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল থাকায় তাদের প্রত্যেকের কাছে সে অশেষভাবে ঋণী এবং সেই ঋণ শোধ প্রত্যেক মানুষের জীবনের অবশ্য কর্তব্য। মানুষ প্রথমত এবং প্রধানত তার পিতা-মাতার কাছে ঋণী, তাদের পরিচর্যা ও আত্মত্যাগ ব্যতীত মানুষের জীবন-ধারণই সম্ভব নয়। সুস্থিত ও শান্তিপূর্ণ সমাজে বাস করে প্রত্যেক মানুষ সেই সমাজের অগণিত নর-নারীর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় তাদের প্রত্যেকের কাছে ঋণী। মানুষের নৈতিক ও ধর্মীয় ধ্যানধারণার মূলে হল বহুযুগের বহু মনীষীর, সাধুসন্তের, বিদ্বজনের, বিজ্ঞানীর অবদান এবং মানুষমাত্রই এদের প্রত্যেকের কাছে—জীবিত অথবা মৃত, প্রত্যেকের কাছে—অশেষভাবে ঋণী। সমাজসেবার মাধ্যমে, পূর্বসূরিদের অনুসরণে, জীবজগতের কল্যাণসাধনের মাধ্যমে এসব ঋণ সাধ্যমতো প্রত্যেক মানুষের শোধ করা অবশ্য কর্তব্য। বলা চলে যে, গান্ধীজি এখানে প্রাচীন ভারতের 'মানুষের সামাজিক দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত মতবাদে'র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। প্রাচীন বৈদিক প্রত্যয়টি হল, 'সমাজবদ্ধ জীবরূপে কোন মানুষই অপরের ওপর নির্ভর না করে একাকী স্বয়ম্ভররূপে জীবনযাপন করতে পারে না। প্রত্যেক মানুষ সমাজস্থ অপর মানুষের দ্বারা, অতীত ও বর্তমান মানুষের দ্বারা, এমনকি মনুষ্যেতর জীব ও নিশ্চেতন জড় পদার্থের দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়। এদের প্রত্যেকের কাছে মানুষ তাই নানাভাবে ঋণী এবং সেজন্য মানুষের উচিত দাতার ঋণ যথাসাধ্য পরিশোধ করা। ঋণ পরিশোধ করতে মানুষ সামাজিকভাবে এবং নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ। এই ঋণ পরিশোধ প্রসঙ্গে বৈদিক সাহিত্যে **'পঞ্চ-মহাযজ্ঞের'** উল্লেখ আছে। যথা— (i) ঋষিযজ্ঞ, (ii) পিতৃযজ্ঞ, (iii) দেবযজ্ঞ, (iv) নৃযজ্ঞ এবং (v) ভূতযজ্ঞ। গান্ধীজিও ঋণ পরিশোধের উপায় হিসাবে এই পঞ্চ-মহাযজ্ঞেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

মানুষমাত্রই এপ্রকারে পরস্পর নির্ভরশীল হওয়ায় প্রত্যেকের কর্ম নিজেকে এবং অপরাপর ব্যক্তিকে, নিজ জীবনকে এবং অপরাপর ব্যক্তির জীবনকে প্রভাবিত করে। এর ফলে, কোন মানুষ পরিণত ও উন্নত হলে সেই সমাজের অপরাপর মানুষও পরিণত ও উন্নত হয়; এবং বিপরীতক্রমে, কোন মানুষের অধঃপতন বা অধোগমন হলে সমাজের অপরাপর মানুষেরও অধোগমন হয়। এজন্য গান্ধীজি বলেন, কোন মানুষ যদি অপরকে পদানত

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ